পূর্ব কথন

ইউরোপ মহাদেশের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পর্তুগাল অন্যতম। আজোর্স (Azors) ও মাদাইরা (Madeira) সহ দেশটির আয়তন মাত্র ৯২,৩৪৫ বর্গ কি.মি. (৩৫,৬৫৫ বর্গ মাইল)। ২০০২ সালের হিসেব অনুযায়ী পর্তুগালের লোকসংখ্যা ১,০০,৮৪,২৪৫।[১] তবে ক্ষুদ্রাকৃতির এ দেশটি একসময় ভৌগলিক আবিষ্কার ও বহির্বাণিজ্য সম্প্রসারণে ইউরোপীয় তথা বিশ্ব ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্তুগালের যুবরাজ হেনরী দি নেভিগেটরের (Henry the Nevigator) নেতৃত্বে পর্তুগিজরা ক্রুসেডের মনোভাব এবং রাজ্যজয়ের আকাঙ্খা নিয়ে দুঃসাহসিক সমুদ্র অভিযানে বহির্গত হয় এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলীয় আজোর্স, কেপভার্দ (Cape Verde), সিউটা দখল করে। হেনরীর জীবিতাবস্থায় পর্তুগিজরা গাম্বিয়া নদীর মোহনা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। হেনরীর মৃত্যুর পরেও পর্তুগিজদের সমুদ্রযাত্রা ও ভারত গমনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে এবং অনেক উদ্যোম, প্রচেষ্টায় শেষাবধি ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো দা গামার (Vasco da Gama) নেতৃত্বে ভারতের কালিকট বন্দরে উপনীত হয়। ভাস্কো দা গামার ভারত আগমন নিঃসন্দেহে বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে এক বিষ্ময়কর আবিষ্কার। তাঁর এ অবিশ্বরণীয় সাফল্যের ফলে এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে জলপথে সরাসরি যাতায়াতের পথ উন্মোচিত হয় এবং উভয় মহাদেশের মধ্যে আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে পারস্পরিক যোগাযোগ ও লেনদেনের এক নতুন দিক রচিত হয়।

ভাস্কো দা গামার ভারত আগমনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তথা প্রাচ্যের সঙ্গে পর্তুগিজ সম্পর্কের সূচনা হয়। ভারতে আগমনের মাত্র দু'দশকেরও কম সময়ের মধ্যে পর্তুগিজরা শক্তিশালী রণতরী ও কামান-বন্দুকের ব্যবহার এবং সেসঙ্গে ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের মাধ্যমে ভারত মহাসাগরে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থানরত আরব ও গুজরাটি মুসলিম বণিকদের আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে নিজেদের একচ্ছত্র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। তারা রাজধানী গোয়াকে কেন্দ্র করে পূর্বদিকে মলুক্কাস পর্যন্ত এবং পশ্চিমে উত্তমাশা হয়ে লিসবন পর্যন্ত বিশাল বাণিজ্যবলয় গড়ে তোলে। পর্তুগিজরা বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের প্রচারকেও গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ

---

[১] *Encarta*, Microsoft Corporation, CD Version, 2003, Portugal (hereafter cited as *Encarta*).

করেছিল। গোয়া কর্তৃপক্ষের পৃষ্টপোষকতা এবং খ্রিস্টধর্মযাজকদের প্রচেষ্টায় ভারতের মালাবার উপকূলীয় অঞ্চল, বাংলা ও শ্রীলংকায় ক্যাথলিক মতবাদের ব্যাপক বিস্তার ঘটে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে পর্তুগিজদের একচেটিয়া আধিপত্য বিদ্যমান থাকে। কালের প্রবাহে ক্রমান্বয়ে প্রাচ্যেও পর্তুগিজ বাণিজ্যের পতন সূচিত হয়। এ অঞ্চলে পর্তুগিজদের অপ্রতিহত বাণিজ্য, এদেশীয় বণিক ও জনসাধারণের উপর তাদের অত্যাচার, নিপিড়ন, জোরপূর্বক ভারতীয় বণিকদের কাছ থেকে শুল্ক ও অর্থ আদায় প্রভৃতিতে মোগল সম্রাট শাহজাহান অতিষ্ঠ হয়ে ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজদের প্রধান ঘাঁটি হুগলি থেকে বিতাড়নের নির্দেশ দিলে ভারতীয় অঞ্চলে পর্তুগিজ বাণিজ্যের বিদায় ঘন্টা বাজে। অন্যদিকে ইংরেজ ও ওলন্দাজ বিরোধীতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রাচ্যে পর্তুগিজ বাণিজ্যের পতনের পথ প্রসারিত করে। ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান পর্তুগিজ ঘাঁটি মালাক্কা দখল করে নিলে সেখানেও পর্তুগিজ বাণিজ্যের পতন তরান্বিত হয়। এসব কারণের সঙ্গে যুক্ত হয় গোয়ার পর্তুগিজ সরকারের প্রশাসনিক দুর্নীতি, ঔপনিবেশিক নীতির কুফল, প্রাচ্যের প্রতি পর্তুগাল কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা ইত্যাদি।

পর্তুগিজরা প্রাচ্যের বাণিজ্যে অংশগ্রহণ এবং খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এশিয়ায় আগমন করলেও তারা তাদের অধিকৃত ও প্রভাবিত অঞ্চলে দাস-ব্যবসা, লুণ্ঠনবৃত্তি, ধর্ষণ, জোরপূর্বক স্থানীয়দের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিতকরণ প্রভৃতি অসামাজিক ও অমানবিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েছিল। হার্মাদা (Armada),[২] ফিরিঙ্গি[৩], বোম্বেটে[৪] প্রভৃতি নামগুলো আজও পর্তুগিজদের লোমহর্ষক অত্যাচার, নির্যাতন ও নৃশংস আচরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে এশিয়ার ইতিহাসে পর্তুগিজ অবস্থানের ইতিবাচক দিকও

---

[২] পর্তুগিজ আর্মাদা বা রণতরী শব্দের বিকৃত বা অপভ্রংশ রূপ হার্মাদা। হার্মাদ অর্থে সাধরণভাবে পর্তুগিজ জলদস্যু বোঝাতো।

[৩] ফরাসি 'ফ্রঙ্ক' থেকে অপভ্রংশ ফিরিঙ্গি শব্দটির উৎপত্তি। আরব ও পারস্যের লোকেরা ফরাসি ধর্মযোদ্ধাদের 'ফেরাঙ্গ' 'ফ্রাঙ্ক' বলতো। পর্তুগিজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা যখন ভারতে আসে তখন আরবরা তাদের ফ্রাঙ্ক বা ফিরিঙ্গি নামে অভিহিত করে।[৩] ফিরিঙ্গি পর্তুগিজদের অত্যাচারে ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যরত মুসলিম ও অন্যান্য বণিকরা অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল।

[৪] পশ্চিম ভারতে বোম্বে অঞ্চলে যে সব পর্তুগিজ বাস করতো, তাদের মধ্যে অনেকে গুরুতর দুর্বৃত্ততার জন্য অপরাধী হতো । পর্তুগিজ শাসকদের শাস্তির ভয়ে এ সব দুষ্ট চরিত্রের লোকেরা বঙ্গে পালিয়ে আসতো। দস্যুবৃত্তিই এদেশে তাদের প্রধান ব্যবসা হতো। বোম্বে অঞ্চল থেকে আসতো বলে তারা বোম্বেটে নামে অভিহিত হতো।

কম ছিল না। ইউরোপের সঙ্গে এশিয়ার সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক তারাই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদের নেতৃত্বে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে, যার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এতদঞ্চলীয় কৃষি, শিল্প তথা অর্থনীতির উপর। আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, জামরুল, কামরাঙ্গা, নোনা, চীনা বাদাম, রাঙা আলু, কমলালেবু প্রভৃতি ফলগুলো আমরা তাদের কাছ থেকেই পাই।[৫] আমাদের নিত্যব্যবহার্য বোতাম, বয়াম, বালতি, বাসন তাদেরই ভাষা এবং তাদের মাধ্যমে এসব দ্রব্যের প্রবর্তন ঘটেছে। কামান, পিস্তল, লস্কর, বজরা, বয়া, মাস্তুল, তুফান প্রভৃতি কথা তাদের কাছ থেকে আমাদের মধ্যে ঢুঁকে গেছে। এ ধরণের প্রচুর সংখ্যক শব্দ ও কথা আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকি।[৬] পর্তুগিজদের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে মালাবার উপকূলে ব্যাপকভাবে শহরায়ন ঘটে এবং মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপন, হাসপাতাল নির্মাণ, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শহরগুলোর জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ফলে দেখা যায় পর্তুগিজদের আগমন একদিকে যেমন এশীয়াবাসীর জন্য ছিল অত্যন্ত পীড়াদায়ক, মর্মবেদনার ইতিহাস, অন্যদিকে তারা এশিয়ার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইতিবাচক প্রভাব রেখে এশীয়াবাসীদের তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করে রেখেছে।

প্রাচ্যে পর্তুগিজদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যথার্থ চিত্র পাওয়া এক দুরুহ ব্যাপার। কারণ পর্তুগিজদের প্রাচ্য বাণিজ্য সম্পর্কে সমকালীন ও প্রত্যক্ষদর্শী পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রমুখ পর্যটক, ভৌগলিক, বণিক ও ঐতিহাসিকগণ দুভাগে বিভক্ত। পর্তুগিজদের শত্রু ওলন্দাজ ও ইংরেজগণ এশিয়ায় পর্তুগিজদের নিপীড়নকারী, ধর্মান্ধ, দুর্নীতিপরায়ণ, বিশৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী প্রভৃতি অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। তাদের বর্ণনায় এশিয়ায় পর্তুগিজদের ইতিবাচক প্রভাবসমূহ খুব কমই উল্লিখিত হয়েছে। অন্যদিকে পর্তুগিজ বিবরণীসমূহে পর্তুগিজদের দুর্নীতি, অর্থলিপ্সা, স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতির কথা উল্লেখ থাকলেও তা অত্যন্ত গৌণ আকারে প্রকাশ পেয়েছে। পর্তুগিজ লেখকগণ তাঁদের প্রাচ্য অভিযানসমূহ এবং বাণিজ্য বিস্তারকে পর্তুগিজদের অসাধারণ কৃতিত্ব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে পর্তুগিজরা ভারত মহাসাগরে সুদীর্ঘ কাল ধরে বাণিজ্যরত আরব ও গুজরাটি মুসলিম বণিকদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের যে চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল সেগুলোকে পর্তুগিজদের বিবরণে আত্মরক্ষার জন্য গৃহীত কৌশল হিসেবে বর্ণনা করাই হয়নি, বরং প্রায় ক্ষেত্রে

---

[৫] সতীশচন্দ্র মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫।

[৬] *তদেব*।

সেগুলোকে যথোপযুক্ত বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেকোনো পন্থায় ক্যাথলিক মতবাদ প্রচারকে মহৎ কর্ম হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য গোয়ার পর্তুগিজ গভর্নর যেসব অমানবিক আইন-কানুন প্রবর্তন করেন সেগুলো কোনোভাবে কোনো সময়ে তিরস্কৃত বা সমালোচনার সম্মুখীন হয়নি।

পর্তুগিজদের প্রাচ্য বাণিজ্যধারা সম্পর্কে যথাযথভাবে মূল্যায়নের জন্য আধুনিক কালে বেশ কিছু গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে, লেখা হয়েছে বিভিন্ন গবেষণামূলক ইতিহাস গ্রন্থ, প্রবন্ধ ইত্যাদি। প্রাচ্যে পর্তুগিজদের কর্মকাণ্ডের উপর সর্বাধিক গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন সি. আর. বক্সার, এফ. সি. ড্যানভার্স, ওম প্রকাশ, অশীন দাস গুপ্ত, কে. এস. ম্যাথিউ প্রমুখ প্রথিতযশা ঐতিহাসিক ও গবেষক। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশের লেখা ও কর্ম মালাবার উপকূলে পর্তুগিজদের সার্বিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বক্সার এবং ড্যানভার্স এশিয়ার উপর পর্তুগিজদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তাদের রচনাবলীতে এশীয় অঞ্চলে পর্তুগিজদের আগমনের পটভূমি, তাদের আধিপত্য বিস্তার ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং প্রাচ্য বাণিজ্যে পতন সম্পর্কে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। পর্তুগিজদের প্রাচ্য বাণিজ্যের অপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- পর্তুগিজ বাণিজ্যের প্রকৃতি এবং প্রভাব সম্পর্কে কারো রচনাতে গুরুত্বসহ স্থান পায়নি। পর্তুগিজ বাণিজ্যের প্রকৃতি এবং প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক, ঐতিহাসিক ও গবেষকের বর্ণনায় যেটুকু এসেছে তা হয় আংশিকভাবে অথবা খণ্ডিত আকারে। অথচ এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভালভাবে ধারণা না থাকলে প্রাচ্য বাণিজ্যে পর্তুগিজদের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানা অপূর্ণাঙ্গ রয়ে যাবে বলে গবেষক মনে করে। সুতরাং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগিজদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিশেষ করে এশীয় অঞ্চলে পর্তুগিজ বাণিজ্যের প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পর্কে আরো অধিক ও বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা হওয়া যে প্রয়োজন তা অনস্বীকার্য। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে এশিয়ায় পর্তুগিজ বাণিজ্যের প্রকৃতি এবং প্রভাবের উপর গুরুত্ব প্রদান করে বর্তমান অভিসন্দর্ভটি সম্পাদনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি সম্পাদনের জন্য প্রাথমিক ও সহায়ক উভয় শ্রেণীর উৎস ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে সমসাময়িক পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসি পর্যটক, বণিক ও ঐতিহাসিকদের রচনাবলীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ফরাসি ভাষায় রচিত তথ্যসমূহ ইংরেজি এবং বাংলা অনুবাদ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। ভাষান্তর প্রক্রিয়া আধুনিক বিশ্বে জ্ঞান অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। গবেষণাকর্ম সম্পাদনেও অনুবাদ প্রক্রিয়ার বহুল ব্যবহার সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। সমকালীন ফারসি ভাষায় রচিত ইতিহাস গ্রন্থের অনুবাদও প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

তাছাড়া সমকালীন বাঙালি কবি-সাহিত্যিকদের রচনাবলীকেও প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সহায়ক উৎস হিসেবে আধুনিক ঐতিহাসিক ও গবেষকদের রচনাবলী, বিশ্বকোষ, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত থিসিস, জার্নাল, গেজেটিয়ার, মানচিত্র প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক এবং সহায়ক উভয় তথ্য সংগ্রহ এবং যাচাইবাছাইকালে এর বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে মূলত ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে প্রয়োজনে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিও অনুসৃত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য সমূহকে যথাসম্ভব যাচাই বাছাই করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের সময় অতিশয়োক্তি, আবেগ ও বৈপরিত্য পরিহার করার চেষ্টা করা হয়েছে। পরস্পর বিরোধী তথ্যের ক্ষেত্রে অধিকতর যুক্তিযুক্ত তথ্যটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের এক্ষেত্রে গৃহীত তথ্যটির মৌলিকত্বের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটিকে ৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রয়োজনানুসারে অধ্যায়গুলোকে বিভিন্ন উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে (উপসংহার) সমগ্র অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে এবং গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটির বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর বানান রীতি অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে। এর ভাষাগত, বানান ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি যথাসম্ভব এড়ানোর জন্য প্রতিটি অধ্যায়ের কম্পিউটার কম্পোজ অত্যন্ত যত্ন সহকারে এবং সতর্কতার সঙ্গে একাধিকবার দেখা হয়েছে। এতৎসত্ত্বেও যে সব ভুলভ্রান্তি রয়ে গেল তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।